

খ বিভাগ

শিশুর বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক

শিশুদের উপযুক্ত বিকাশের জন্য উন্নত পারিবারিক পরিবেশ প্রয়োজন। এর পাশাপাশি প্রয়োজন উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ। শিশুর সার্বিক বিকাশে খেলাধুলার পাশাপাশি শখ ও বিনোদনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিবন্ধী শিশুরা আমাদের সমাজেরই একজন। তাই এদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানা জরুরি। জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী শিশুর অধিকারগুলো জানাও আমাদের একান্ত প্রয়োজন। একটি শিশুকে পরিবার ও সমাজের সুনামের হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- পরিবার ও সমাজের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শিশুর বিকাশে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারব।
- শিশুর সার্বিক বিকাশে খেলাধুলার শখ ও বিনোদনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রকারভেদ এবং তাদের প্রতি পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী শিশুর অধিকারগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঝুঁকি পূর্ণ শিশুশ্রম ও শিশুপাচার প্রতিরোধে করণীয় বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিবার ও সমাজের সদস্য হিসেবে শিশু

পাঠ ১- পরিবার ও সমাজে শিশু

আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পরিবারে বাস করি। একটি বাড়িতে সাধারণত মাবাবা, ভাইবোন আরও অন্যান্য সদস্য একসাথে থাকার যে প্রতিষ্ঠান সেটি হলো পরিবার। সন্তানেরা শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পৌঁছায়। সন্তানদের বিয়ের মাধ্যমে আরও কয়েকটি পরিবার তৈরি হয়। এভাবে পরিবারের জীবনচক্র চলতে থাকে।

অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানবশিশু সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। সে থাকে সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল। শিশু খুব ধীরে ধীরে বড় হয়। তার আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য বছরের পর বছর সহায়তা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দরকার হয়। পরিবার এ দায়িত্ব পালন করে। পরিবার শিশুর আশ্রয়। জন্মের পর থেকে সমবয়সীদের সাথে মেলামেশার পূর্ব পর্যন্ত শিশুটিকে পরিবারই সজা দিয়ে থাকে।

জন্মের পর পরিবারের সাথে শিশুর একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। বড় হওয়ার সাথে সাথে এই সম্পর্ক পরিবর্তন হতে থাকে। সে নিজের কাজ নিজে করতে পারে, নিজের মতামত দিতে পারে, পরিবারের ছোটখাটো কাজে অংশ নিতে পারে। পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে শিশুরা পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে যায়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যে যতো বেশি একে অন্যের সহযোগিতা করে, অন্যের বিপদে এগিয়ে আসে, দুঃখকষ্ট ভাগাভাগি করতে পারে, কষ্টভাবাপন্ন হয়, পরিবারের কাজে অংশ নেয় সে তত পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হতে পারে।

পরিবার সমাজের ক্ষুদ্র একক। কয়েকটি পরিবার নিয়ে হয় একটি সমাজ। আদিম যুগে যখন পরিবার প্রথা ছিল না তখনো মানুষকে খাবার জোগাড় করতে হতো, হিংস্র প্রাণী থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হতো, এ রকম ভয়ানক বিপদ ও কষ্টের মধ্যে মানুষ নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য দল বেঁধে থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এভাবে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দলবেঁধে থাকতে শুরু করে এবং সমাজ জীবনের শুরু হয়।

শিশুর বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক

পরিবার শিশুটির খাদ্য, বস্ত্র, আরামের চাহিদা মেটায়, নিরাপদ পরিবেশ দেয়, নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়। শিশুটির এই প্রয়োজন মেটাতে খাদ্যশস্যের জন্য কৃষক, কাপড়ের জন্য তাঁতি, চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, শিক্ষার জন্য শিক্ষক এভাবে সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ পরিবারটির সাহায্যে এগিয়ে আসে। সমাজের এই সহযোগিতা ছাড়া পরিবারের একার পক্ষে চলা সম্ভব হয় না। এভাবে পরিবার ও সমাজ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। শিশু যেমন পরিবারের একজন সদস্য, তেমনি সমাজেরও একজন সদস্য।

বর্তমানে আমাদের চাহিদা অনেক বেশি ও বহুমুখী। পরিবারকে সহায়তার জন্য অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষা ও আচরণের জন্য স্কুল ও কলেজ, স্বাস্থ্যসেবায় হাসপাতাল, সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য আইন-আদালত, পণ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। যদিও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিবারকে অনেক কাজে নানাভাবে সহায়তা দিচ্ছে, তবু শিশুদের জন্য প্রাথমিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিবারকেই গ্রহণ করতে হয়। যেমন- শিশুর স্বাস্থ্য, আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি দেওয়া, গ্রহণযোগ্য সামাজিক আচরণ শেখানো ইত্যাদি।



শিশুর স্বাস্থ্য সেবায় সামাজিক সহায়তা

প্রত্যেক সমাজে কিছু নিয়মনীতি থাকে। পরিবার সমাজের এসব নিয়মনীতি অনুযায়ী শিশুকে আচরণ করতে শেখায়। সবার সাথে ভালো ব্যবহার, নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা, সহযোগিতা করা ইত্যাদি আচরণ সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে ঝগড়া, মারামারি করা, খারাপ ব্যবহার, পরিবেশ নোহারা করা, অন্যের সম্পদ নষ্ট করা ইত্যাদি আচরণ সমাজ আশা করে না। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। সঠিক ও গ্রহণযোগ্য আচরণ নিয়ে শিশু বেড়ে উঠলে সমাজ ও দেশের উন্নতি হয়। এভাবে প্রতিটি শিশু পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে দেশের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

কাজ ১-পরিবারের সদস্য হিসেবে তোমার কী ধরনের দায়িত্ব পালন করা উচিত তা লেখো।

কাজ ২-তুমি কী গুণাগুণ নিয়ে বেড়ে উঠলে সমাজের উপকারে আসতে পার তা লেখো।

পাঠ ২ – পারিবারিক পরিবেশের ভূমিকা

মানুষের সুস্থ বিকাশের জন্য উন্নত পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্ব অনেক।

যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে আমরা কোনো পরিবারকে উন্নত পরিবেশের অধিকারী বলতে পারি তা হলো –

- যে পরিবারে প্রত্যেক সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক থাকে। সেখানে যেকোনো অভিজ্ঞতা বা সমস্যা একে অপরের সাথে আলোচনা করা যায়, একে অন্যের বিপদে ভালো পরামর্শ দেয়, সহযোগিতা করে এবং ঝগড়াঝাঁটি হয় না।
- যে পরিবারে শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে, খেলাধুলার সুযোগ থাকে, বড় সদস্যরা ছোট শিশুর সাথে খেলাধুলায় অংশ নেয়, শিশুদেরকে গান, গল্প, ছড়া শোনায়, কৌতূহল মেটানোর জন্য বাইরের পরিবেশে নিয়ে যায়, শিশুর বিভিন্ন প্রশ্নে বিরক্ত না হয়ে যেভাবে সম্ভব বুঝিয়ে দেয়া হয়।
- যে পরিবারে শিশুকে প্রশংসা করা হয়, শিশুর বিভিন্ন দক্ষতা বিকাশের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়।

- যে পরিবারে অন্য শিশুদের সাথে মেলামেশায় সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং যে পরিবারে বয়স্কদের সাথে শিশুর সাক্ষাতের সুযোগ থাকে।
- যে পরিবারে শিশুর সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শিশু পরিচালনা নীতি অনুসরণ করা হয়।

জীবনের প্রথম ৫ বছর পরিবার থেকে শিশু যেরকম শিক্ষা, যত্ন পেয়ে থাকে তার মধ্যে সেরকম আচরণের ভিত্তি তৈরি হয়। মা, বাবা এবং পরিবারের সদস্যরা শিশুর প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক। তারা শিশুর সবরকম ভালো অভ্যাস তৈরিতে সহায়তা করেন। পারিবারিক পরিবেশ থেকে যদি শিশু ভালো কাজের জন্য উৎসাহ পায় তাহলে সেটা তাড়াতাড়ি শেখে। যে কাজ করলে সকলে অপছন্দ করে সেটা খারাপ কাজ বলে ধারণা লাভ করে। পরিবার থেকে তাদের ভালো এবং মন্দ কাজের অভ্যাস তৈরি হয়।

পরিবার যখন শিশুকে বাড়ির বাইরের পরিবেশে নিয়ে যায়, তাদের বিভিন্ন কৌতূহল মেটায়, সমবয়সীদের সাথে খেলার সুযোগ করে দেয়, শিশুরা তখন সহজেই সকলের সাথে মেলামেশা করার ক্ষমতা অর্জন করে। শিশুকে যখন গান, গল্প, ছড়া শোনানো হয় তখন শিশুর ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, স্বরণশক্তি, মনোযোগ ইত্যাদি মানসিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। সমবয়সীদের সাথে মেলামেশার ফলে শিশু সহযোগিতা ও গ্রহণযোগ্য সামাজিক আচরণ করতে শেখে। বড়দের সাথে মেলামেশায় শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ে।



যেকোনো কাজে উৎসাহ ও প্রশংসা শিশুর দক্ষতা বাড়ায়



মা-বাবার সঙ্গ শিশুকে অধিক নিরাপত্তা দেয়



পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণে শিশু নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভাবে

শিশুকে সঠিকভাবে পরিচালনার অন্যতম কৌশল হলো শিশুর সাথে ইতিবাচক আচরণ করা। শিশুকে সব সময় এটা কোরো না, ওটা কোরো না, তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না এ ধরনের নেতিবাচক কথা শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এসো আমরা এ কাজটা করি, তুমি এখন পারছো না, তাতে কী? চেষ্টা করলেই পারবে, তুমি এটা করলে আমরা সবাই তোমাকে অনেক ভালো বলবো, এ ধরনের প্রতিটি কথা শিশুর বিকাশের জন্য ইতিবাচক।

শিশুরা তাদের আবেগ তীব্রভাবে প্রকাশ করে। অল্পতেই সে চিৎকার করে কাঁদে, ভয় পায়, রেগে যায়। শিশুর রাগ, ভয়, কষ্টে অবহেলা না করে সহানুভূতির সাথে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করলে শিশু সুখী হয়। পরিবারের সঠিক পরিচালনায় একটি শিশু পরিবার ও সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ এবং উপযুক্ত সদস্য

হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। মা-বাবা, ভাইবোনের সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠতা ও স্নেহের সম্পর্ক থাকে বলে পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিশু বিভিন্ন আচরণের কৌশল শেখে।

কাজ ১- শিশু পরিচালনায় কিছু নেতিবাচক উক্তি ও ইতিবাচক উক্তির তালিকা করো।

কাজ ২- উন্নত পারিবারিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করো।

পাঠ ৩ - শিশুর বিকাশে পরিবারের ভূমিকা

শিশু খুব অসহায় ও পরনির্ভরশীল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে হাঁটতে পারে, কথা বলতে পারে, আনন্দে হাসতে পারে, অন্যকে সাহায্য করতে পারে। ওপরের আচরণগুলো প্রত্যেক শিশুর বিভিন্ন ধরনের বর্ধন ও বিকাশ। বিকাশ অর্থ গুণগত পরিবর্তন এবং বর্ধন হচ্ছে পরিমাণগত পরিবর্তন যা শিশু ধীরে ধীরে অর্জন করে। এই পরিবর্তন প্রধানত শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা মানসিক, আবেগীয় ও সামাজিক হয়ে থাকে।

১। শারীরিক বিকাশ (Physical Development)- এর মধ্যে পড়ে দেহের আকৃতি, অনুপাত, চেহারা, শরীরবৃত্তীয় কাজ (যেমন- রুৎস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি), ইন্দ্রিয় ও সংগলন দক্ষতা (দেখা, শোনা, স্পর্শ, স্বাদ), হাঁটা, দৌড়ানো, শারীরিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

২। মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ হলো (Cognitive Development)- বুদ্ধিগত দক্ষতার পরিবর্তন। এর মধ্যে পড়ে মনোযোগ, স্মরণশক্তি, প্রতিষ্ঠানিক ও প্রাত্যহিক জীবনের জ্ঞান, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা, ভাবার দক্ষতা, যুক্তি দিয়ে বোঝার ক্ষমতা ইত্যাদি।

৩। আবেগীয় ও সামাজিক বিকাশ (Emotional and Social Development)-ক্রোধ বা রাগ, ভয়, উদ্বেগ, হিংসা, আনন্দ-উল্লাস ইত্যাদিতে যে আলোড়িত অবস্থা হয় তা হচ্ছে আবেগীয় বিকাশ। বিভিন্ন অনুকূল সামাজিক বিকাশের মধ্যে পড়ে সহযোগিতা, সমবেদনা, অংশগ্রহণ, পরোপকার, নিঃস্বার্থ হওয়া। অসামাজিক আচরণ হলো আক্রমণাত্মক আচরণ, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, ধ্বংসাত্মক আচরণ ইত্যাদি।



শারীরিক বিকাশ



বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ



আবেগীয় ও সামাজিক বিকাশ

শিশুর সব ধরনের বিকাশে প্রথম ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষেত্র হলো পরিবার। শিশুর বিকাশে অন্য যে বিষয়গুলো প্রভাবিত করে সেগুলোর কোনোটিই পরিবারের সমতুল্য নয়। পরিবারে মা-বাবা, ভাইবোনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এটা সারা জীবনের জন্য তৈরি হয়।

মা-বাবার ভূমিকা

শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তুলতে মা হচ্ছেন প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শিশুকে দুধ খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে মা ও সন্তানের সম্পর্কের শুরু হয়। মায়ের হাসি, মায়ের কণ্ঠস্বর শিশুর মধ্যে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে। মায়ের সাথে যোগাযোগের জন্য সন্তানের জন্মগত চাহিদা থাকে। মা সন্তানের যত্ন আনন্দের সাথে সম্পন্ন করেন যা সন্তানের সুস্থ বিকাশে সহায়ক।

শিশুদের লালনপালনে ও যত্নে মায়ের পাশাপাশি বাবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেসব পরিবারে বাবা শিশুকে সজ্ঞা দেন, ভাব বিনিময় করেন, সেখানে শিশুরা নিজেদেরকে বেশি নিরাপদ মনে করে। তাদের মধ্যে সামাজিক ও আচরণগত সমস্যা কম হয়। বাবা-মায়ের পর্যাপ্ত স্নেহের অভাবে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের ক্ষতি হয়। বয়সানুযায়ী ওজন বাড়ে না, কাজে আগ্রহ হারায়, তাদের চেহারা মলিন ও বিমর্ষ থাকে।

ভাই ও বোনের ভূমিকা

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। পরিবারের অন্য সদস্যরা বিশেষ করে বড় ভাইবোন শিশুর সামনে যে ধরনের আচরণ করে শিশুটিও সে ধরনের আচরণ শেখে। ভাইবোনের সাথে সম্পর্ক শিশুর বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ভাইবোনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলে একজন অপরজনকে সজ্ঞা দেয়, ভাগাভাগি করতে শেখে, যেকোনো সমস্যার কথা খোলাখুলি আলোচনা করতে পারে। এভাবে সে জীবনের যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে সহজেই খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা অর্জন করে। অন্যদিকে ভাইবোন ঈর্ষা, একজন অন্যজন অপেক্ষা নিজেকে বড় মনে করা, একে অন্যকে ঘৃণা করা ইত্যাদি মনোভাব পরিবারে বিক্ষোভ এবং অশান্তি আনে। তাদের মধ্যে আক্রমণধর্মী আচরণ, ঝগড়া করার প্রবণতা বেড়ে যায়। একজনের প্রয়োজনে অন্যজন এগিয়ে আসে না। এরকম পরিস্থিতিতে উভয়ের মন খারাপ থাকে, তাদের সময়টা আনন্দে কাটে না।

কাজ ১- পরিবারে ভাইবোনেরা একে অন্যকে কোন বিষয়ে কীভাবে সাহায্য করবে তার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

পাঠ ৪- শিশুর বিকাশে সমাজের ভূমিকা

পরিবারের পর আর কোন চালিকাশক্তি শৈশব ও কৈশোরের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে? উত্তরটি খুবই স্পষ্ট। সেটি হলো সমবয়সি দল। বিদ্যালয় বয়স থেকে শিশুরা বড় একটা সময় সমবয়সিদের সাথে কাটায়। তারা শ্রেণিকক্ষে থাকে, পড়াশোনার বাইরে নানারকম কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে, প্রচারমাধ্যম যেমন-রেডিও, টিভি, কম্পিউটার সম্পর্কে নানারকম আলাপ আলোচনা তারা বন্ধুদের সাথে করে। তারা অগণিত খেলা বন্ধুদের সাথে খেলে।

এ বয়সে শুধু পরিবারের সাথে সময় কাটানো তাদের সন্তুষ্টি আনতে পারে না। মা-বাবা এবং সমবয়সি দল একে অন্যের পরিপূরক হয়। মা-বাবার স্নেহ নির্দেশনা শিশুদের নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়। কিন্তু সামাজিক বিভিন্ন দক্ষতার জন্য সমবয়সিদের সাথে মেলামেশার দরকার হয়। যেমন—একে অন্যকে সাহায্য করা, মতামত ও ধারণা আদানপ্রদান, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শেখা ইত্যাদি। তারা উজ্জ্বল পরিস্থিতিতে একে অন্যকে সাহায্য করে থাকে।

খেলার মাঠে খেলার সঙ্গীদের সাথে শিশুরা দলীয় খেলায় অংশ নেয়। দলীয় খেলায় তারা দক্ষতা অর্জন করে যেমন—ভাষার বিকাশে দক্ষতা আসে, পরিকল্পনা করতে শেখে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হয়, নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে যে ভালো ফল করা যায় এ ধারণা পায়।

দলের প্রভাবে অনেক সময় খারাপ আচরণের অভ্যাস হয়ে থাকে। সমবয়সিরা প্রাধান্য বিস্তার করলে মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হয়। ছেলেমেয়েরা বাড়ির কাজ, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। এ থেকেই মা-বাবার সাথে কলহের সূত্রপাত হয়।



কৈশোরের সমবয়সি দল
পরিবারের পরই বিকাশের মূল চালিকাশক্তি

স্কুল — শিক্ষার্থীদের পরিবার ও সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসাবে গড়ে তুলতে স্কুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্কুল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে জ্ঞান বিতরণ করা হয়। এই কাজে মুখ্য ভূমিকা রাখেন স্কুলের শিক্ষকেরা। তারা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আগ্রহ সৃষ্টি করেন, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করেন। এ সকল বিকাশে শিক্ষকেরা যেভাবে ভূমিকা রাখেন—

- পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করেন।
- শিক্ষকেরা ভালো আচরণে উৎসাহিত করেন, খারাপ আচরণের ফলাফল বুঝিয়ে সতর্ক করেন।
- শিক্ষকের প্রশংসা শিক্ষার্থীদের ক্লাসে অংশগ্রহণ বাড়ায়, ভালো ফল করতে উৎসাহী করে এবং স্কুলের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে।
- পছন্দের শিক্ষকের অনুকরণে শিক্ষার্থীরা আচরণ শেখে ও জীবনের লক্ষ্য স্থির করে।



শিশুরা সব সময় উৎসাহ পেতে চায়। অনেক সময় শিক্ষকের দেওয়া শারীরিক শাস্তি বা শাস্তির ভয় দেখানো শিশুর বিকাশের জন্য ক্ষতিকর হয়। এতে শিশুর মনে ভয় হয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষককে কোনো প্রশ্ন করতে পারে না এবং মানসিক চাপ বাড়ে যা মস্তিষ্ক গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।

প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন

প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের সাহায্য ছাড়া পরিবারের একার পক্ষে চলা খুব কঠিন। নানা ধরনের সহযোগিতার পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের সাহায্য শিশুর বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পারিবারিক বিপর্যয়, যেমন—পরিবারে মা কিংবা বাবার মৃত্যু, অসুস্থতা, যেকোনো মতবিরোধ বা পারিবারিক দুর্ঘটনায় তারা বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত বাড়ান। এসব বিপর্যয়ে শিশু সন্তানদের স্নেহ, ভালোবাসা, উপদেশ ও পরামর্শের প্রয়োজন হয়। নির্ভর করা যায় এমন প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের সাথে সন্তানেরা খোলামেলা আলোচনা করতে পারে। এতে তাদের বিশেষ করে কৈশোরের ছেলেমেয়েদের হতাশা কম হয়, তারা বিপদকে মোকাবেলা করতে শেখে, বিশৃঙ্খল আচরণ কম হয়, সর্বোপরি তাদের সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে সহজভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

কাজ ১— সমবয়সী দলের মাধ্যমে শিশুরা কোন ধরনের আচরণ শেখে?

কাজ ২— স্কুলে পাঠক্রমের বাইরের কার্যক্রম কোন ধরনের আচরণ বিকাশে সহায়তা করে, তা লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য কিসের প্রয়োজন?

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ক. অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা | খ. নিরাপদ পরিবেশে বসবাস |
| গ. বছরের পর বছর শিক্ষা | ঘ. অপরের ওপর নির্ভরশীলতা |

২. সমবয়সীদের সাথে মেলামেশার ফলে শিশুর মধ্যে গড়ে উঠে—

- আত্মবিশ্বাস
- সহযোগিতার মনোভাব
- পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রুমা ও কণা দুই বোন। প্রত্যেকে যেন নিজের কাজ নিজে করে, এ ব্যাপারে তাদের মা তাদের উৎসাহিত করেন। রুমা ৭ম শ্রেণির এবং তার বোন কণা ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। রুমা প্রায়ই তার বোনের বই, কাপড় ও বিছানা গুছিয়ে দিয়ে থাকে।

৩. বুমার মাঝে কোন ধরনের মনোভাব লক্ষ করা যায়—

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ক. সহযোগিতার | খ. শৃঙ্খলাবোধের |
| গ. নেতৃত্বদানের | ঘ. সমবেদনার |

৪. বুমার আচরণ কণাকে পরবর্তী সময়ে করে তুলবে—

- i. কর্মে অনগ্রহী
- ii. পরনির্ভরশীল
- iii. অন্যের প্রতি সহমর্মী

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. কর্মব্যস্ত স্বামী ও দুই সন্তান সুমন ও সুমনাকে নিয়ে রেবেকার সংসার। রেবেকা সন্তানদের সাথে বন্ধুর মতো ভাব বিনিময় করেন। সমবয়সীদের সাথে তাদের সহযোগী মনোভাব তৈরিতে রেবেকা সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। সুমন ও সুমনার বাবা শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর সন্তানদের সময় দেন ও তাদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে ও পার্কে বেড়াতে নিয়ে যান।

- ক. পরিবার কী?
- খ. দেশের সুনাগরিক তৈরিতে সমাজের নিয়মনীতি অনুসরণ প্রয়োজন কেন?
- গ. সন্তানদের প্রতি রেবেকার আচরণ শিশুর কোন ধরনের আচরণ বিকাশে সহায়ক? বুঝিয়ে লেখো।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবেশ শিশুদের সুস্থ বিকাশের সহায়ক—বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

২. ৭ম শ্রেণিতে পড়ুয়া রনি তার সহপাঠীদের সাথে লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে। রনি তার বন্ধুদের নিয়ে তার এলাকাকে দূষণমুক্ত করতে সবুজ সংঘ নামে একটি সংঘ তৈরি করে। রনি ও তার বন্ধুরা এলাকাবাসীর সহায়তায় এলাকার ময়লা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার জন্য কয়েকটি বড় ড্রামের ব্যবস্থা করে। রনি ও তার বন্ধুদের দ্বারা পরিচালিত 'সবুজ সংঘ' এলাকার উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের কাজ করে যা সবার কাছে প্রশংসিত হয়। রনির মা রনিকে এ ব্যাপারে সব সময় উৎসাহ দেন।

- ক. শিশুকে সঠিকভাবে পরিচালনার অন্যতম কৌশল কী?
- খ. ভাইবোনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজন কেন?
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজের মাধ্যমে রনির চরিত্রের কোন গুণটি বিকশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. মায়ের উৎসাহ ও ভালো সজ্ঞার প্রভাব রনিকে আজ সুপরিচিত করেছে—উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো।

পঞ্চম অধ্যায়

শিশুর বিকাশে খেলাধুলা

শিশুর খেলা

শিশুরা খেলে, কারণ খেলা তাদের আনন্দ দেয়। খেলা শুধু আনন্দই দেয় না, খেলার মাধ্যমে শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক দক্ষতার বিকাশ ঘটে। লাধুলা বুদ্ধিমত্তা বাড়ায়, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা শেখায় এবং ভাগাভাগি করে নেওয়ার মনোভাব তৈরিতে সাহায্য করে। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশু-সঙ্গী সাথীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। শিশুরা নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে, অন্যকে বুঝতে শেখে, অন্যের অনুভূতিকে মূল্য দিতে শেখে। খেলাধুলা তাদের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায় বোধ জাগ্রত করে। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা কল্পনা ও নতুন কিছু সৃষ্টির চর্চা করে।

শৈশবের প্রথম বছরগুলোতে যখন শিশুর মস্তিষ্কক পড়াশোনার জন্য প্রস্তুত থাকে না, তখন খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা অনেক কিছু শিখতে পারে। যেমন- শব্দ, অক্ষর, সংখ্যা মুখস্থ করার চেয়ে খেলার মাধ্যমে শিশুকে শেখানো সহজ হয়। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত যে, খেলা শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকেরা দেখেছেন যে, খেলাধুলা শিশুর শারীরিক ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনের সহজ মাধ্যম যা তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে। খেলা শিশুদের অভিজ্ঞতা বাড়ায়, আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার চর্চা শিশুর বিনোদনের মাধ্যম। খেলাধুলা শিশুকে অপরাধ প্রবণতা থেকে রক্ষা করে। যেসব শিশুর কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতা আছে খেলাধুলা তাদের জন্য উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে।

পাঠ ১ – খেলাধুলার শ্রেণিবিভাগ

বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে খেলাকে বিভিন্ভাবে শ্রেণিকরণ করা হয়। যেমন-

অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা- শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে শিশুরা যে খেলাগুলো খেলে থাকে তাই অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা। যেমন- দৌড়াদৌড়ি, বল খেলা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা, গাছে চড়া ইত্যাদি। জন্মের পর প্রথম দুই বছর শিশু হাত-পা নাড়াচাড়া করে, আঙুল মুখে দিয়ে আনন্দ পায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অঙ্গ সঞ্চালনে পরিবর্তন ঘটে। একটু বড় হলে হামাগুড়ি দেওয়া, দোলা, দৌড়ঝাঁপ, বেয়ে ওঠা ইত্যাদি অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা শিশু করে থাকে। সাধারণত ৫ বছরের পর থেকে শিশুরা এ ধরনের খেলায় দক্ষতার পরিচয় দেয়। ৭ ও ৮ বছর বয়সে শিশুরা দলবদ্ধ হয়ে অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা করে থাকে। যেমন- ফুটবল, বৌছি, গোয়ালুট, দাঁড়িয়াবান্ধা ইত্যাদি।

আবিষ্কারমূলক খেলা— অনেক সময় শিশু খেলনাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে খেলনার গঠন রহস্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে। এতে খেলনাটি ভেঙে যায় ঠিকই কিন্তু খেলনার ভেতরে যন্ত্রপাতি দেখে শিশু আনন্দ পায়। এ থেকে শিশু বস্তুর আকার আকৃতি, কীভাবে এগুলো তৈরি হয়েছে, কীভাবেই বা কাজ করে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

গঠনমূলক খেলা— শিশু যখন তার নিজের ধারণা এবং অনুভূতি দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করে, তখন সেটা গঠনমূলক খেলা হয়। সাধারণত ৩ বছর বয়সের পর থেকে শিশুর মধ্যে গঠনমূলক খেলার প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। যেমন— কাগজ দিয়ে প্লেন ও নৌকা তৈরি, বালি, কাদামাটি, আটার মণ্ড ও ব্লক দিয়ে বাড়ি, সেতু ও নানা আকৃতির জিনিস তৈরি করে শিশু আনন্দ পায়। এতে শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে। শিশুরা ছবি আঁকা ও রং করার মাধ্যমে সহজেই নিজের ধারণা ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে।



আবিষ্কারমূলক খেলা



গঠনমূলক খেলা



কাল্পনিক বা নাটকীয় খেলা

কাল্পনিক বা নাটকীয় খেলা— সাধারণত ২ ও ৩ বছর বয়সের শিশুরা বাস্তব জীবনের অনুকরণে অভিনয় করে খেলে। যেমন— শিশু মা সেজে খেলে, ডাক্তার ও রোগীর ভূমিকায় অভিনয় করে, গাড়িচালক, ফেরিওয়ালা, পাইলট ইত্যাদি চরিত্র অনুকরণ করে খেলে। এই খেলা শিশুর কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করে, সমাজে কার কী ভূমিকা বা দায়িত্ব সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

দর্শন ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে আনন্দ লাভ

অনেক সময় শিশুরা নিজে অংশগ্রহণ না করে অন্যের খেলা দেখেও আনন্দ পায়। টিভি দেখা, গল্প শোনা ইত্যাদিও এক ধরনের খেলা, যা থেকে শিশুরা আনন্দ লাভ করে। এতে ভাষার বিকাশ হয়, চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

স্থানভেদে খেলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

১) বহিরাঙ্গন খেলা (Outdoor Games) ও

২) অভ্যন্তরীণ খেলা (Indoor Games)

১) বহিরাঙ্গন খেলা- যে খেলা গৃহের বাইরে খোলা মাঠ বা জায়গায় খেলা হয় তাকে বহিরাঙ্গন খেলা বলে। যেমন- ফুটবল, কাবাডি, ক্রিকেট, গোলাছুট, কানামাছি ইত্যাদি। এ ধরনের খেলায় অঙ্গ সঞ্চালন হয় যা শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন।



বহিরাঙ্গন খেলা- ফুটবল

২) অভ্যন্তরীণ খেলা- গৃহ পরিবেশ অথবা আবদ্ধ স্থানে অনুষ্ঠানযোগ্য খেলাকে অভ্যন্তরীণ খেলা বলে। যেমন- দাবা, বাগাডুলি, ব্রক দিয়ে খেলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি। এ ধরনের খেলায় বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে।

পাঠ ২ - শারীরিক বিকাশে খেলাধুলা - শিশুকালে এমন অনেক খেলা আছে যে খেলাগুলো করতে দেখলে বোঝা যায়, শিশুর বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে এগোচ্ছে। খেলা শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ ও শক্ত করে।

- অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলাধুলার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুত ও গভীর হয়। এতে শরীরের রক্ত সঞ্চালন বাড়ে, যা শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে।
- খেলার মাধ্যমে যে ব্যায়াম হয়, যার ফলে হৃদযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের বিশেষ উপকার হয়। খেলাধুলা না করলে বা অলসভাবে সময় কাটালে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা ও বৃদ্ধি স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না।
- খেলাধুলার ফলে যে আনন্দ, বিনোদন হয় তাতে দেহমন উপকৃত হয়। খেলাধুলা তাদেরকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করে যে, তাদের মধ্যে নতুন উদ্যম ও সচেতনতা ফিরে আসে।
- শিশুরা বড় হলে তাকে যে বিষয়গুলো মোকাবেলা করতে হবে, তার জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলা তাকে পূর্বপ্রস্তুতি দেয়। বড় হয়ে শিশুকে অনেক পরিশ্রমী হতে হয়, খেলার মাধ্যমে পরিশ্রমী হওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়। অন্যতেই শিশু ক্লান্ত হয় না।
- শারীরিক পরিশ্রম না হলে খাবার থেকে প্রাপ্ত খাদ্যশক্তি দেহে জমা থাকে। খেলাধুলার ফলে এসব বাড়তি শক্তি দহনের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়। ফলে শিশু সুস্থ ও সবল থাকে। তা না হলে এসব অতিরিক্ত শক্তি দেহে মেদ হিসেবে জমা হয় এবং শিশুর ওজন বেড়ে যায়।
- বেশিরভাগ বহিরাঙ্গন খেলা শিশুর শারীরিক বিকাশ এবং সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শিশুর সুস্থতা ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পিতামাতারও মানসিক সজ্জা আছে।

সুতরাং শারীরিক বিকাশে খেলাধুলা যেভাবে সহায়তা করে তা হলো-

- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়া-চাড়ার ফলে ব্যায়াম হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত হয়
- রক্ত চলাচল ভালো হয়
- দূষিত পদার্থ ঘামের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়ে যায়
- মাংস পেশি সতেজ ও সবল থাকে
- পেশি চালনার নৈপুণ্য অর্জিত হয়
- হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, ফলে ক্ষুধা বাড়ে
- ঘুম ভালো হয়



অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা শরীরকে সুস্থ রাখে

বর্তমানে শহরকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনে পর্যাপ্ত খেলার মাঠের অভাবে শিশুরা গৃহের ভেতরের খেলা খেলতে বাধ্য হয়। এর মধ্যে কম্পিউটার গেইম অন্যতম। কম্পিউটারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলায় কোনো অঙ্গ সঞ্চালন হয় না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত হয় না, দেহের ওজন বেড়ে যেতে পারে। ঘাড়ে, পিঠে ও কোমরে ব্যথা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া কম্পিউটার স্ক্রিনে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকার কারণে চোখের নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।



দীর্ঘ সময় কম্পিউটার গেইম খেলা শরীরের অনেক ধরনের ক্ষতি করতে পারে

কাজ ১ – তোমার জানা বহিরাঙ্গন খেলা ও অভ্যন্তরীণ খেলার তালিকা তৈরি করো।

কাজ ২ – শারীরিক বিকাশে অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলার গুরুত্ব বর্ণনা করো। দীর্ঘ সময় কম্পিউটার গেইম খেলা কেন ক্ষতিকর তা লেখো।

পাঠ ৩ – সামাজিক বিকাশে খেলাধুলা

খেলাধুলা যেমন আমাদের আনন্দ দেয় তেমনি আমাদের সামাজিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ খেলাধুলা আমাদের সামাজিক গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করে। দলগত খেলার মাধ্যমেই সাধারণত শিশু সামাজিক গুণগুলো অর্জন করে। যেমন— খেলার মাধ্যমে শিশু যখন অন্যের সাথে মেলামেশা করে, কথা বলে, দল গঠন করে, দলে নেতৃত্ব দেয় তখন থেকেই শিশুর মধ্যে সামাজিকতার বিকাশ ঘটে।

বয়সের সাথে সাথে শিশু খেলাধুলার মাধ্যমে সামাজিক হতে শেখে। যেমন—

একাকী খেলা— শিশু জন্মের প্রথম বছরে একা একা নিজের হাত-পা নিয়ে খেলে। কোনো জিনিস নেড়েচেড়ে দেখে, চুষে ও বাজিয়ে শব্দ করে সে আনন্দ পায়। এটা একাকী খেলা। এখানে বস্তু ব্যবহার থাকতে পারে আবার নাও পারে। এ বয়সে তার সামাজিক বিকাশ হয় না বলেই সে একা একা খেলে।

পাশাপাশি খেলা— একে অন্যের সাথে না খেলে পাশাপাশি বসে একই সরঞ্জাম দিয়ে খেলে। তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ থাকে না। এটাই সামাজিকতার প্রথম ধাপ। দেড় থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা এই ধরনের খেলা খেলে।

সহযোগিতামূলক খেলা— পরস্পরের মধ্যে খেলার সামগ্রী বিনিময় বা আদানপ্রদান করে খেলে। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়স থেকে শিশুরা এ ধরনের খেলা খেলতে শুরু করে।



একাকী খেলা



পাশাপাশি খেলা



সহযোগিতামূলক খেলা



সমবায় খেলা

সমবায় খেলা— এই খেলা শিশুরা দলগঠন করে খেলে। যেমন—ক্রিকেট, ফুটবল, হাডুডু ইত্যাদি। শৈশবে নিজেরাই খেলার নিয়মকানুন তৈরি করে খেলে। ফলে তাদের মধ্যে দলীয় নিয়মকানুন মেনে চলা, সচেতনতা, সহযোগিতা করার প্রবণতা ইত্যাদি সামাজিক গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। পাঁচ বা ছয় বছর বয়স থেকেই শিশুদের মধ্যে সমবায় খেলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

খেলার মাধ্যমে শিশু যে সামাজিক গুণাগুণ অর্জন করে সেগুলো হচ্ছে—

- নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
- সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়
- নেতৃত্ব দানের গুণাবলির বিকাশ হয়
- দলের সাথে সহজে খাপ খাওয়ানো শিখে
- খেলার সরঞ্জাম ও তথ্য আদানপ্রদান করা শিখে
- গঠনমূলক কাজের বিকাশ ঘটে
- রীতিনীতি, আইনকানুন মেনে চলার প্রবণতা তৈরি।



দলীয় খেলার মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক বিকাশ ঘটে

অতি শৈশবে শিশু মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে খেলে। ফলে শিশুর সাথে পরিবারের সবার একটি মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। দলগত খেলা শিশুর সামাজিক গুণাবলি অর্জনের সাথে সাথে নৈতিক গুণাবলি বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নৈতিকতার প্রাথমিক শিক্ষা যদিও শিশু পরিবার থেকে অর্জন করে তবে চর্চা হয় খেলার মাঠে। আত্মবিশ্বাস, ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দ বোঝার ক্ষমতা, সৎ ও সত্যবাদিতা ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধ শিশু খেলার মাধ্যমে সহজেই অর্জন করতে পারে।

কাজ ১— তোমার জানা দুটি খেলার বর্ণনা দাও। খেলাগুলো কীভাবে সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে লেখো।

পাঠ ৪ – বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা বিকাশে খেলাধুলা

আমরা অনেক ধরনের খেলা খেলি। তার মধ্যে কতগুলো খেলা আমাদের বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়। যে যত বুদ্ধিমান সে তত সৃজনশীল। বুদ্ধি হচ্ছে একটি মানসিক ক্ষমতা, যার মাধ্যমে আমরা সহজেই পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারি। যেকোনো ধরনের খেলাই হোক না কেন, বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ বা কৌশলী না হলে খেলায় নৈপুণ্য দেখানো যায় না।



ছবি আঁকা



দাবা খেলা

বুদ্ধি বিকাশের ধারা অনুযায়ী শিশুরা ভিন্ন ভিন্ন খেলা খেলে। যেমন— আবিষ্কারমূলক খেলা, গঠনমূলক খেলা, সৃজনধর্মী খেলা ও নাটকীয় খেলা। এইসব খেলা শিশুর বুদ্ধিমত্তা বিকাশে সহায়তা করে। কারণ এসব খেলার মাধ্যমে শিশু চিন্তা ও কল্পনা শক্তি প্রয়োগ করে বুদ্ধির প্রকাশ ঘটাতে পারে। তবে শিশুর বুদ্ধিমত্তা বিকাশে সৃজনশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সৃজনশীলতা শিশুকে গতিশীল করে। খেলার মাধ্যমে সহজেই সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটানো যায়। সৃজনশীলতা অর্ধ হচ্ছে নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রকাশ বা নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা। কাগজ, কাঠের টুকরা, কাদা, বালু, ব্লক, ফুল, ডাল, পাতা, ফেলে দেওয়া বিভিন্ন ধরনের জিনিস যেমন— কাগজের বাজ, ডিসপোজেবল কাপ, কৌটা ইত্যাদি দিয়ে শিশু যখন নতুন কিছু তৈরি করে তখনই সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে। শিশু সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের অব্যক্ত ইচ্ছার প্রকাশ সহজেই ঘটাতে পারে।

বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশে প্রয়োজন

১। চিন্তার সহজ ব্যবহার— এটা সৃজনশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুরা ছবি আঁকে, রং করে, গল্প ও কবিতা লিখে নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারে। তবে এর জন্য দরকার চিন্তার প্রসারতা, শব্দভান্ডার বৃদ্ধি, শব্দের সমর্থক শব্দ জানা এবং সেটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা। বাধাহীনভাবে ও সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা প্রকাশ করতে পারার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো যায়।

২। স্বকীয়তা বা নিজস্বতা— সৃজনশীল আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সব সময় স্মৃতিকে ব্যবহার না করে নতুন কিছু সৃষ্টির চিন্তা করা। এর মধ্যে থাকতে হবে শিশুর নিজস্বতা ও নতুনত্ব।

খেলার মাধ্যমে শিশুর বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতা বিকাশে যা করণীয়—

- শিশুদের খেলার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া। গঠনমূলক, আবিষ্কারমূলক ও সৃজনশীল খেলায় শিশুকে উৎসাহিত করা।
- খেলা যাতে শিশুর কৌতূহল বাড়তে পারে, সেদিকে লক্ষ রেখে খেলার উপকরণের ব্যবস্থা করা। যেমন— গাছের ডাল, ফুল, পাতা, কাগজ, রং, তুলি, কাদা মাটি ইত্যাদি।
- শিশুদের খেলার সরঞ্জাম নিরাপদ ও আকর্ষণীয় হওয়া।

- খেলার স্থান পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস পূর্ণ, খোলামেলা ও নিরাপদ হওয়া।
- খেলায় অগ্রহী করার জন্য বয়স উপযোগী সঠিক খেলনা শিশুকে দেওয়া।
- শিশুকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলতে দেওয়া ও সব সময় খেলায় হস্তক্ষেপ না করা।

শিশুর জীবনে সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য দামি খেলনা বা ব্যয়বহুল উপকরণের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন খেলার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন ধরনের খেলায় শিশুকে উৎসাহিত করা।

কাজ ১- কোন কোন খেলা তোমার সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায় তার তালিকা করো।

পাঠ ৫- শিশুর শখ ও বিনোদন

শখ শব্দের অর্থ হচ্ছে মনের ঝোঁক বা আগ্রহ। আর বিনোদন হচ্ছে তাই যা মনকে প্রফুল্ল রাখে। শিশুদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের শখ লক্ষ করা যায়। যেমন- কেউ ডাকটিকিট সংগ্রহ করে, কেউ খেলনা সংগ্রহ করে, কেউ মুদ্রা সংগ্রহ করে, কেউ ছবি, ভিউকার্ড, পোস্টার সংগ্রহ করে। গল্প বা কবিতার বই পড়ে, কেউ বা ফেলে দেওয়া কৌটা, ছোট বাস্র সংগ্রহ করে; আবার কেউ ভ্রমণ করে, ছবি ঐকে, বাগান করে শখ পূরণ করে। শখ ও বিনোদন অনেকটা নির্ভর করে নিজের ইচ্ছাশক্তি ও পরিবেশের ওপর। শখ ও বিনোদনের অনেক শিক্ষাগত দিক রয়েছে।



ডাকটিকিট



সমুদ্রসৈকত

ডাকটিকিট- ডাকটিকিট সংগ্রহ করে দেশ ও বিদেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আবার প্রতিযোগিতায় ডাকটিকিট প্রদর্শন করে পুরস্কার লাভ করা সম্ভব।

বই- ছড়া, রম্যরচনা, মুক্তিযুদ্ধের বই, কার্টুন, রহস্যমূলক বই, খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের জীবনী, গল্প ও কবিতার বই পড়ে জ্ঞানভান্ডার, কল্পনা ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

ভ্রমণ— ভ্রমণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক নিসর্গের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশের রূপালি নদী, সবুজ বনানী, নীল আকাশ ও গ্রামবাংলার নান্দনিক রূপ লাভ করা যায়। বাংলার দর্শনীয় স্থানগুলো হচ্ছে— ঢাকার লালবাগ কেন্দ্রা, সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ, শিশু পার্ক, যাদুঘর, ফয়'জ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, রাজশাহী, সিলেটের মাধবকুন্ড জলপ্রপাত, জাফলং-এর পাহাড়ি নদীর স্বচ্ছ জলধারা, খাসিয়া পল্লী, কুয়াকাটার সাগরসৈকত, কুমিল্লার ময়নামতি পাহাড়, নওগাঁর পাহাড়পুর ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করে জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করা যায়।

মুদ্রা সংগ্রহ— পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত আছে এবং এর নামও বিভিন্ন। আবার মুদ্রার উপর বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, স্থান ও প্রতীকের ছাপ থাকে। যেমন— বাংলাদেশের মুদ্রার ওপর শাপলা, ইলিশ মাছ, হরিণ, কাঁঠাল ইত্যাদির ছবি আছে। এইসব ছবি থেকে একটি দেশের কৃষি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।

ভিউকার্ড, পোস্টকার্ড— ভিউকার্ড, পোস্টকার্ডে বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য স্থান, নামকরা ব্যক্তি, কৃষি ও শিল্পপণ্য, শিল্পকর্ম, প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকে। এ থেকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। নিজের হাতে ছবি ঐক্যে কার্ড তৈরি করে যেমন আনন্দ লাভ করা যায় তেমনি সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।



গান গাওয়া



বাগান করা

গান ও কবিতা আবৃত্তি— গান গেয়ে ও কবিতা আবৃত্তি করে অবসর সময়কে কাজে লাগানো যায়। স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নিজে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় অন্যকেও আনন্দ দেওয়া যায়।

বাগান করা ও পশুপাখি পালন— বাড়ির আঙিনায়, টবে, বাড়ির ছাদে ফুল, ফল ও সবজি বাগান করে নিজের শখ পূরণ করা যায়, বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায় এবং পরিবারের ফল ও সবজির চাহিদা মেটানো যায়। কবুতর, কোয়েল পাখি, মুরগি, হাঁস, ছাগল ইত্যাদি পালন করে শখ ও বিনোদন লাভ করা যায়। শিশুর সার্বিক বিকাশে, সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে শখ ও বিনোদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কাজ ১— পড়াশোনার পাশাপাশি তুমি কীভাবে তোমার শখ পূরণ কর তা বর্ণনা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোনটি গঠনমূলক খেলা?

- | | |
|----------------|------------------|
| ক. সাঁতার কাটা | খ. সাইকেল চালানো |
| গ. পুতুল তৈরি | ঘ. কানামাছি |

২. কোন খেলাটির মাধ্যমে নেতৃত্বদানের গুণটি গড়ে উঠে?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. রং করা | খ. দাবা |
| গ. ফুটবল | ঘ. ছবি আঁকা |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফাহিম খুব ভালো ছাত্র। অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ে ও ছবি আঁকে খুব মজা পায়। মায়ের সাথে দাবা খেলে প্রায়ই সে জিতে যায়।

৩. খেলার মাধ্যমে ফাহিমের মাঝে কোনটির বিকাশ ঘটে?

- | | |
|---------------------|----------------|
| ক. নৈপুণ্যতা | খ. সামাজিকতা |
| গ. অনুকরণীয় মনোভাব | ঘ. পেশির সবলতা |

৪. নিচের কোন ক্ষেত্রে ফাহিমের অগ্রগতি হচ্ছে?

- i. মানসিক বিকাশ
- ii. বুদ্ধিমত্তা
- iii. উদ্ভাবনী শক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. ফারাজ তার বিদ্যালয়ের ফুটবল টিমের নির্ভরযোগ্য গোলকিপার। সে প্রতিবেশীর বিপদে-আপদে সহযোগিতা করার চেষ্টা করে। অবসর সময়ে সে প্রায়ই কাগজ কেটে বিভিন্ন রকমের ফুল, পাখি ও নকশা তৈরি করে। এছাড়া ডাকটিকিট সংগ্রহ করা এবং বই পড়াও তার অন্যতম শখ।
 - ক. দাবা কোন ধরনের খেলা?
 - খ. মুদ্রা সংগ্রহ করার অভ্যাস কেন বিনোদনের পাশাপাশি জ্ঞান বৃদ্ধিতেও সহায়ক?
 - গ. অবসর সময় কাটানোর উপায়টি ফারাজের মাঝে কোন ধরনের বিকাশ ঘটায়? ব্যাখ্যা করো।
 - ঘ. ফারাজকে অনুসরণ করার মাধ্যমে সামাজিক গুণ অর্জন সহজেই সম্ভব- বিশ্লেষণ করো।
২. সুমিতা একজন কর্মজীবী গৃহিণী। পাঁচ বছর বয়সি একমাত্র মেয়ে মিতাকে তিনি সব সময় পুষ্টিকর খাবার খেতে দেন। মিতা টিভি দেখে ও কম্পিউটারে গেমস খেলে অবসর সময় কাটায়। ইদানীং সুমিতা খেয়াল করছেন মিতা দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে এবং সমবয়সি বাচ্চাদের সাথে মেশার পরিবর্তে একা একা গেমস খেলে।
 - ক. প্রতিটি সুস্থ শিশু দিনের অধিকাংশ সময় কী করে কাটায়?
 - খ. বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে খেলার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় বুঝিয়ে লেখো।
 - গ. মিতার শারীরিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করো।
 - ঘ. মিতার সময় কাটানোর প্রক্রিয়া তার সামাজিক বিকাশে কীরূপ প্রভাব ফেলবে- বিশ্লেষণ করো।

ষষ্ঠ অধ্যায় প্রতিবন্ধী শিশু

আমাদের চারপাশে এমন কিছু শিশু দেখা যায় যারা স্বাভাবিক শিশুদের মতো নয়। তাদের দেহের গঠন আলাদা, তাদের আচরণ স্বাভাবিকের তুলনায় ধীর বা সমস্যাগ্রস্ত। এদের মধ্যে কেউ চোখে ভালো দেখতে পায় না, কারও হাঁটাচলায় অসুবিধা, কারও অন্যের কথা বুঝতে দেরি হয়, কেউ বা বয়সে বড় হলেও শিশুদের মতো আচরণ করে। এসব শিশু কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার। এরাই প্রতিবন্ধী শিশু। এদেরকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুও বলা হয়। কারণ এদের পূর্ণ বিকাশে বিশেষ যত্ন ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। এসব প্রতিবন্ধীদের জীবন যাপনে সহায়তার জন্য এদের সম্বন্ধে আমাদের সবার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। এজন্য প্রতিবছর ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়।

কেউ জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে, কেউ জন্মের পর যেকোনো দুর্ঘটনা, অগুণ্টি বা গুরুতর অসুস্থতার কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ প্রতিবন্ধী। এই হিসাবে আমাদের দেশে প্রায় ১.৫ কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। দরিদ্র দেশ হিসেবে আমাদের দেশে এই সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাঠ ১ – প্রতিবন্ধিতার শ্রেণিবিভাগ

প্রতিবন্ধিতা বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন – শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ইত্যাদি।

শারীরিক প্রতিবন্ধী

যাদের হাত কিংবা পা অসম্পূর্ণ, অবশ, দুর্বল থাকে, দেহের গঠন স্বাভাবিক নয় বা দেহের কোনো অংশ ব্যবহারে অক্ষমতা থাকে, যার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাপনে অসুবিধা হয়, তারাই শারীরিক প্রতিবন্ধী। যেমন – পায়ের গঠনে ত্রুটি থাকলে চলাচলে এবং হাতের গঠনে ত্রুটি থাকলে কাজ করতে অসুবিধা হয়। বুদ্ধিগত কোনো সমস্যা না থাকলে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে পারে। তাদেরকে শারীরিক সমস্যার জন্য বিভিন্ন সহায়ক উপকরণের সহায়তায় চলাফেরা করতে হয়। যেমন – ক্রাচ, ওয়াকার, হুইল চেয়ার ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে চলাচলের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গায় র‍্যাম্প (সিঁড়ির স্থানগুলোতে ঢালু রাস্তা) – এর ব্যবস্থা করলে তাদের চলাচলে বিশেষ সুবিধা হয়।



শারীরিক প্রতিবন্ধী

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

চোখে দেখতে পারে না বা চোখে দেখায় এমন ধরনের সমস্যা থাকে যার কারণে জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে অসুবিধা হয় এবং যারা চোখে আংশিক বা পুরোপুরি দেখতে পায় না তারাই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দেখতে সমস্যা হয় বলে চলাফেরা ও কাজকর্ম ধীরে হয়, এসব অসুবিধা তাদেরকে পরনির্ভর করে রাখে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার মাত্রা বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন—অল্প মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা এবং আংশিক মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা। অল্প মাত্রার প্রতিবন্ধীরা অন্ধকার ছাড়া কোনো কিছুই দেখে না বা উজ্জ্বল আলো আসার গতিপথ বলতে পারে। এরা অন্ধ, সংখ্যার ধারণা, শব্দ ভান্ডার এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শিশুর মতোই হয়। তারা স্পর্শ দিয়ে বস্তু চেনে, বস্তুর নাম শেখে। জন্মগত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা অন্যদের সাথে তাদের পার্থক্য বুঝতে পারে না, যেসব দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু পরবর্তী সময়ে অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার কারণে দৃষ্টি হারায় তাদের মনের কষ্ট অনেক বেশি। আংশিক মাত্রার প্রতিবন্ধীরা দূরের জিনিস দেখতে পারে না। কাছের জিনিস অস্পষ্ট দেখলেও কাজ করতে তাদের অসুবিধা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির নাম ব্রেইল পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে স্পর্শের মাধ্যমে উঁচু ফোঁটা দিয়ে বর্ণ ও সংখ্যা তৈরি করে লেখাপড়া করানো হয়।

 <p>স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু যেভাবে দেখতে পায়</p>	 <p>আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু যেভাবে দেখতে পায়</p>	 <p>শুধু একটি উজ্জ্বল আলো আসার গতিপথ বলতে পারে</p>	 <p>পুরোপুরি দৃষ্টিহীন শিশু যা দেখে</p>
--	--	--	--

শ্রবণ প্রতিবন্ধী—যাদের শোনার ক্ষমতায় ঘাটতি, যার কারণে কথা শুনতে বা কথা বলার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এদের ক্ষেত্রে বধির বা কালা এবং কানে খাটো ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। একটি স্বাভাবিক শিশু শব্দ ও কথা শোনে, তারপর তারা কথা বলতে শেখে। যেহেতু শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা শব্দ বা কথা শুনতে পারে না, তাই তারা কথা বলতে শেখে না। জন্ম থেকেই বা কথা শেখার আগেই এ সমস্যা দেখা দিলে ভাষার বিকাশ হয় না। এই সমস্যা অল্প বা গুরুতর হতে পারে। অল্প মাত্রার সমস্যা হলে তারা জোরে কথা বললে কিছুটা শুনতে পারে। গুরুতর শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা থাকলে কোনো শব্দই শুনতে পায় না। তারা কথা বলার পরিবর্তে অজ্ঞাতজি দিয়ে বা ইশারায় নিজের চাহিদা প্রকাশ করে। এদের কথা কেউ বুঝতে পারে না বলে সব সময়ই এরা হতাশাগ্রস্ত থাকে।

পাঠ ২- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী

যাদের বুদ্ধি বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম থাকে, যার ফলে শিশু তার সমবয়সীদের মতো আচরণ করতে পারে না। শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই সমস্যা ধরা পড়ে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতারও বিভিন্ন মাত্রা থাকে। যেমন- মৃদু, মধ্যম, গুরুতর।

মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা - এদের বুদ্ধি ৮ থেকে ১১ বছরের শিশুর মতো হয়। তাই প্রাপ্তবয়সে ১১ বছরের স্বাভাবিক ছেলেমেয়েরা যেসব লেখাপড়া বা কাজ করার বুদ্ধি রাখে, ততটুকু পর্যন্ত মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুটি লেখাপড়া বা আচরণ করতে পারে। এদেরকে বিশেষ শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভর করা সম্ভব।

মধ্যম বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা- এদের বুদ্ধি ৬ থেকে ৮ বছরের শিশুর মতো হয়। তাই ১৮ বা তদূর্ধ্ব বয়সে মধ্যম মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা ৬ থেকে ৮ বছরের শিশুর মতো আচরণ করে। এদের বাচন ক্রটি ও নানারকম শারীরিক সমস্যা থাকতে পারে। যেমন- ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ, শিশুসুলভ ভাষা ইত্যাদি। এদের প্রশিক্ষণ দিলে কিছু শিখতে পারে। এই প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে এদের পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করা। এদেরকে কায়িক শ্রমভিত্তিক কাজ শেখানো যায়। যেমন-প্যাকেট করা, সিল মারা, বেকারির কাজ ইত্যাদি।

গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা- এদের বুদ্ধির মাত্রা এত কম থাকে যে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের মতো হয়। তারা খাওয়া, পরিচ্ছন্নতা, টয়লেট কাজ সম্পন্ন করতে অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে। এদের অনেক ধরনের আচরণের সমস্যা দেখা যায়। অন্যের তত্ত্বাবধানে এদের জীবন ধারণ করতে হয়। বিশেষ যত্ন ও প্রশিক্ষণে তাদের দৈনন্দিন কাজের অভ্যাস তৈরি করা যায়।



বাক্ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু

আমাদের সমাজে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের অনেক সময় পাগল বলে মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা কোনো মানসিক রোগ নয়। এটি এক ধরনের মানসিক অবস্থা বা অক্ষমতা। এই অক্ষমতা চিকিৎসা দিয়ে সারানো যায় না। তবে যে যতটুকু মাত্রায় প্রতিবন্ধী, সে বিশেষ যত্ন পেলে তার ক্ষমতা অনুযায়ী আচরণ করতে পারে। আবার বিশেষ যত্নের অভাবে তার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হয় না। তার আচরণের অবনতি ঘটে।

এছাড়া একই সাথে একাধিক প্রতিবন্ধিতা থাকলে তারা বহুবিধ প্রতিবন্ধী। যেমন- শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ ও বাক্, বুদ্ধি ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধিতার মাত্রা গুরুতর হলে তা সহজেই শনাক্ত করা যায়। এ ধরনের প্রতিবন্ধীরা খাবার ও টয়লেটের কাজের জন্য প্রায় অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে বা বিশেষ সরঞ্জাম ছাড়া তারা চলাফেরা করতে পারে না। মৃদু ও মাঝারি মাত্রার প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা কিছুটা কঠিন হয়। একটি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ সম্পর্কে জানা থাকলে অতি সহজেই শিশুটি প্রতিবন্ধী কি না তা বোঝা যায়। স্বাভাবিক শিশুর মতো প্রতিবন্ধীদেরও মৌলিক চাহিদা রয়েছে। তাদের জন্য প্রয়োজন ভালোবাসা, উপযুক্ত খাবার, বিশেষ যত্ন ও প্রারম্ভিক উদ্দীপনার।

তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে, প্রারম্ভিক উদ্দীপনার অর্থ কী? উদ্দীপনা বলতে বোঝায় একটি শিশুকে তার চারপাশের বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে জানা ও দেখার সুযোগ করে দেওয়া আর সেগুলো নিয়ে খেলা করার পরিবেশ সৃষ্টি করা। যেমন—শিশুকে সময় দেওয়া, শিশুর সাথে কথা বলা, গান করা, খেলাধুলা করা, কাজ করা, তাকে ভালোবাসা ইত্যাদি। অতি শৈশব থেকে এই উদ্দীপনার সুযোগ সৃষ্টি করাই হলো প্রারম্ভিক উদ্দীপনা।



অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য দরকার হয়
বিশেষ সহায়ক সরঞ্জাম

প্রতিটি শিশুর দেহ ও মন সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার জন্য প্রারম্ভিক উদ্দীপনা দরকার। স্বাভাবিক শিশুরা সহজেই মেলামেশার মাধ্যমে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে এই উদ্দীপনা পায়। কিন্তু প্রতিবন্ধ শিশুদের পক্ষে তার চারপাশের জগৎকে জানা ও বোঝা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এদের জন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি যত্ন, বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। আমাদের প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা স্বাভাবিক শিশুর উপযোগী করে তৈরি করা হয়। প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও পরবর্তী সময়ে এই শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয় না। তার জন্য দরকার প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষা। শিশু যত ছোট অবস্থায় এই উদ্দীপনা বা বিশেষ শিক্ষা পায়, তত তাড়াতাড়ি তার আচরণের উন্নয়ন ঘটে এবং সক্ষমতা বাড়ে।



কাজ ১- তোমার পরিচিত কোনো প্রতিবন্ধী শিশুর ধরন সম্পর্কে লেখো।

কাজ ২- কী ধরনের প্রারম্ভিক উদ্দীপনা দেওয়া হয় তা লেখো এবং ক্লাসে পড়ে শোনাও।

পাঠ ৩- প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি পরিবারের দায়িত্ব

প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে জানার আগে প্রতিবন্ধী শিশুটির কারণে পরিবারটি কী ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়ে, আমরা তা জেনে নিই—

সমস্যা ১

পরিবারটি যখন সন্তানের অস্বাভাবিকতা বুঝতে পারেন, তখন তারা চিকিৎসকের কাছে যায়। চিকিৎসকের কাছে সন্তানের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে শোনার পর মা-বাবা বিষয়টি মেনে নিতে পারেন না। তখন তারা বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে ছোট্টাছুটি করেন। এতে অনেক দেরি হয়ে যায়। ফলে প্রারম্ভিক উদ্দীপনা ও বিশেষ যত্ন পেতে শিশুটির বিলম্ব হয়। সব পিতামাতার মনে প্রশ্ন জাগে, আমার সন্তানটি কবে ভালো হবে? সে কি কোনো দিন কথা বলতে পারবে? কবে থেকে সে বয়স অনুযায়ী আচরণ করবে? তারা মনে করেন, অন্যান্য রোগের মতো প্রতিবন্ধিতাও চিকিৎসার মাধ্যমে সারানো সম্ভব। তাদের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে অনেক কষ্ট হয় যে, তাদের সন্তানের এই প্রতিবন্ধিতা সারা জীবনের জন্য বহন করতে হবে।

সমস্যা ২

প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম হওয়ায় বিভিন্ন কারণে মায়ের মন ভেঙে যায়। যেমন— অনেক ক্ষেত্রে মাকে এরকম সন্তান জন্ম দেওয়ায় দোষারোপ করা হয়। সন্তানের দেখাশোনার জন্য মায়ের ওপর প্রচণ্ড কাজের চাপ পড়ে। তখন সন্তানটির প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়ার জন্য তিনি উৎসাহ পান না।

সমস্যা ৩

প্রতিবন্ধী শিশুটির চিকিৎসা, বিশেষ যত্ন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত শ্রম, সময়, ধৈর্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়। এগুলোর ব্যবস্থা করতে পরিবারটিকে সমস্যায় পড়তে হয়।

সমস্যা ৪

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে নানা রকম অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায়। অতিরিক্ত চঞ্চলতা, জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা, একই কাজ বারবার করা ইত্যাদি আচরণের কারণে সব সময় তাকে দেখে রাখার দরকার হয়। ফলে প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে গেলে আত্মীয়স্বজনেরা অনেক সময় বিরক্ত হন।

প্রতিবন্ধী শিশুর পরিবারের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সমস্যার কথা তোমরা জানলে। তোমরা আগের পাঠে জেনেছ যে, শিশুর উপযুক্ত বিকাশের জন্য দরকার উন্নত পারিবারিক পরিবেশ। প্রতিবন্ধী শিশুটির ক্ষেত্রেও উন্নত পারিবারিক পরিবেশ ও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। এজন্য যা যা করণীয়—

- প্রতিবন্ধী শিশুটিকে অন্য স্বাভাবিক শিশুর মতোই ভালোবাসা দিতে হবে। পরিবারের মধ্যে মা-বাবা, ভাই-বোনের কাছে যদি সে ভালোবাসা পায়, তবে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদেরাও তাকে সেভাবে ভালোবাসবে।
- শিশুর প্রতিবন্ধিতা বোঝার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকে তাকে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম শিখতে সাহায্য করা এবং তার ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- শিশুর জন্য বিশেষ যত্ন, চিকিৎসা সেবা ও সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন- স্বল্প মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধীর জন্য শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর জন্য চশমা, ছড়ি, শারীরিক প্রতিবন্ধীর জন্য ক্রাচ, হুইল চেয়ার, লাঠি, বিশেষ নকশার চেয়ার, জুতা ইত্যাদি।
- যেকোনো অনুষ্ঠানে পরিবারে সবার সাথে তাকে বেড়াতে নিতে হবে। যেমন- পিকনিক, বিয়ে, শিশু পার্ক, মেলা ইত্যাদি। সেখানে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তাদের সাথে কথা বলতে বলা, যা কিছু নতুন সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুটি সহজেই সবার সাথে খাপ খাওয়াতে শিখবে। অনেক সময় বাড়িতে অতিথি এলেও শিশুটিকে সামনে আনা হয় না, একা ঘরে রাখা হয়। এতে তার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

- প্রতিবন্ধী শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় অপুষ্টির শিকার বেশি হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে অপুষ্টির কারণেও প্রতিবন্ধী হতে দেখা যায়। যেমন-“ভিটামিন এ”-এর অভাবজনিত কারণে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়। এজন্য স্বাভাবিক শিশুর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুটির বয়স অনুযায়ী সুখম খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পরিবারে বাবামায়ের সাথে ভাই-বোন বা অন্যান্য সদস্যদেরও প্রতিবন্ধী শিশুটির বিশেষ যত্নে অংশগ্রহণ করতে হবে। এতে বাবা-মায়ের বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে এবং তারা প্রতিবন্ধী শিশুটির প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হতে পারবেন।



প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য প্রয়োজন ভালোবাসা
ও বিশেষ যত্ন

কাজ ১- একজন প্রতিবন্ধীর জন্য পরিবারের দায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে লেখো।

পাঠ ৪- প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি সমাজের দায়িত্ব

সমাজ কাদের নিয়ে? সমাজ আমাদের নিয়ে, আমাদের চারপাশের সকলকে নিয়ে। প্রতিবন্ধী শিশুরা সমাজে বড়ই অবহেলিত। তাদের অবহেলার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো—

- প্রতিবন্ধী শিশুরা কম বুঝতে পারে বলে অনেকেই এদেরকে বোকা, পাগল বলে, হাসি-ঠাট্টা করে।
- সমবয়সিরা প্রকাশ্যে তাদের উত্ত্যক্ত করে। খেলায় নেয় না, তার সাথে মেশে না।
- আত্মীয়স্বজন প্রায়ই বেড়ানোর প্রোগ্রামে এদেরকে তালিকা থেকে বাদ দেন।
- এরা অসুস্থতার কথা ঠিকভাবে বোঝাতে পারে না। এজন্য এদের চিকিৎসায় প্রচুর সময়ের দরকার হয়। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসায় অবহেলা দেখা যায়।
- বিশেষ প্রশিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষক, কর্মচারী আন্তরিক না হলে এদের অযত্ন হয়। যেমন—এদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলা, এদের প্রতি মনোযোগের অভাব ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধী শিশুদের সহায়তার জন্য কীভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করা দরকার?

প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী আমাদের অবশ্যই তাকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন—দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতি, শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধীর জন্য ইশারায় ভাষা শিক্ষা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের নিজের কাজ নিজে করতে পারার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া, তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের উপার্জন করার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যই থাকে শিশুটি যেন আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। এই কার্যক্রম তখনই সফল হবে, যখন শিক্ষকেরা তাদের প্রতি যত্নবান হবেন। তাদের সৌহার্দপূর্ণ কর্তৃত্ব, ধৈর্য, আন্তরিকতা একজন প্রতিবন্ধী শিশুকে প্রশিক্ষণে উৎসাহী করবে, স্কুলে আসতে আগ্রহী করে তুলবে।

তোমরা যদি প্রতিবন্ধী শিশুটির আত্মীয়, প্রতিবেশী, সহপাঠী কিংবা সমবয়সি হও, তবে তোমরাও তার উদ্দীপনা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারো। তোমরা যা যা করতে পারো—

- যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুটিকে সঙ্গ দেওয়া, দেখাশোনার দায়িত্ব তুমি নিজে নিতে পারো।
- প্রতিবন্ধীদের ধরন অনুযায়ী খেলাধুলার আয়োজন করতে পারো। যেমন—দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের গল্প শোনানো, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের সাথে দাবা খেলা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর সাথে গান, গল্প, ছবি আঁকা ইত্যাদি।
- এলাকায় কোনো প্রতিবন্ধী দরিদ্র হলে তার জন্য আর্থিক সহায়তার উদ্যোগ নিতে পারো।
- ছোট শিশুরা প্রতিবন্ধী শিশুকে ভয় পায়। তার এই ভয় দূর করার জন্য তুমি ভূমিকা রাখতে পারো। প্রতিবন্ধী শিশুটির অসুবিধাগুলো ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিলে ঐ স্বাভাবিক শিশুটিও প্রতিবন্ধী শিশুটির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে উঠতে পারে।
- প্রতিবন্ধী শিশুটির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে নানাভাবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারো।

সমাজ ও পরিবারের সবার সহযোগিতায় একজন প্রতিবন্ধী কীভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, তার একটি ঘটনা তোমাদের জানাই, জন্মগতভাবে চোখে দেখে না ছোট্ট মেয়ে কাজল। তার মা বাবা যখন জানতে পারলেন তাঁদের সন্তান দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তখন তাঁরা দিশাহারা হয়ে পড়লেন। পাঁচ বছর আগে আস্তে আস্তে দৃষ্টি হারিয়ে যাওয়া দাদি বললেন আমিও একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। আমি এখনো শব্দ ও স্পর্শ দিয়ে সব কিছু বুঝতে পারি। ওকেও এভাবে শেখাতে হবে। তাঁরা নিকটস্থ পরামর্শ কেন্দ্রের সাহায্যে শিশুটিকে শোনার, অনুভব করার, কোনো কিছুর গন্ধ নেওয়ার প্রচুর উদ্দীপনা দিতে শুরু করলেন। দাদি তাঁর সাথে প্রচুর কথা বলতেন, গান শোনাতে। তাকে স্পর্শ করে চলাফেরা শেখানো হলো। খেলার মাঠে নেওয়া হলো। তিন-চার বছর থেকে সে নিজেই বাথরুমে যেতে পারত। ছয় বছর বয়সে সে বিশেষ স্কুলে যেতে শুরু করল। প্রতিবেশী ছেলেমেয়েরা তাকে সাথে নিয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য আসত। পাড়ার লোকজন যখন তাদেরকে দেখত তারা বুঝতেই পারত না কে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধী শিশুটির পরিবারের প্রতি যতভাবে সম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়ানো প্রয়োজন। আমাদের সব কাজের মাধ্যমে বোঝাতে হবে যে প্রতিবন্ধী শিশুটির পাশে আমরাও আছি। সমাজের সবার অফুরন্ত ভালোবাসা তাদের এগিয়ে দিতে সাহায্য করবে। তাদের জগৎটাকে সহজ ও সুন্দর করে তুলবে। প্রতিবন্ধী শিশুর বিশেষ যত্ন, মনোযোগ ও ভালোবাসায় সে আরও বেশি সক্ষম ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারবে।



প্রতিবেশীরা বুঝতেই পারে না কে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

কাজ ১- প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে তার পরিবার যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা নিরসনে তার আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও শিক্ষক কীভাবে সহযোগিতা করতে পারেন তা লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কোন তারিখে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ক. ২রা ডিসেম্বর | খ. ৩রা ডিসেম্বর |
| গ. ৪ঠা ডিসেম্বর | ঘ. ৫ই ডিসেম্বর |

২. সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ শিশুকে সহায়তা করতে পারে-

- i. উপযুক্ত বিকাশে
- ii. অক্ষমতা হ্রাস করতে
- iii. আত্মনির্ভরশীল হতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চয়ন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। শিক্ষকের মুখে বলা কথা শুনে সে ঠিকমতো খাতায় লিখতে পারে। কিন্তু বোর্ডের লেখাগুলো ঠিকমতো খাতায় তুলতে পারে না। ফলে শ্রেণির কাজ সময়মতো করতে পারে না। এজন্য শিক্ষক তার উপর অসন্তুষ্ট হতো। এতে ধীরে ধীরে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। শ্রেণি শিক্ষক বিষয়টি লক্ষ করে চয়নের বাবামাকে জানালে তাঁরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

৩. চয়ন হলো

ক. শ্রবণ প্রতিবন্ধী

খ. বাক প্রতিবন্ধী

গ. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী

ঘ. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

৪. কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে চয়নকে এ অবস্থার শিকার হতে হতো না?

i. পরিবারের সহযোগিতা

ii. শিক্ষকের সহযোগিতা

iii. সময়মতো চিকিৎসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. প্রান্তি ও প্রত্যয় দুই ভাইবোন। প্রত্যয়ের বয়স দুই বছর কিন্তু প্রান্তি এখন কিশোরী। প্রান্তি প্রায়ই প্রত্যয়ের মতো আচরণ করে এবং অকারণে হাসতে থাকে। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে গান শুনিয়ে, ছবি আঁকতে দিয়ে এবং গল্প শুনিয়ে ব্যস্ত রাখে। সবাই প্রান্তির কথা মন দিয়ে শোনে, তার মা ধৈর্যের সাথে তার যত্ন নেন।

ক. সমাজ কাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে?

খ. প্রারম্ভিক উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় কেন?

গ. প্রান্তির আচরণে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. প্রান্তির পরিবারের সবার আচরণ তাঁর সুস্থতার সহায়ক- বিশ্লেষণ করো।

সপ্তম অধ্যায়

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশুর অধিকার

শিশুকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। আমরা পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েকেও শিশু বলি, আবার দশ-এগারো বছরের ছেলেমেয়েকেও শিশু বলে থাকি। শিশু মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য শিশুকালকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে, জন্মের পর থেকে বয়ঃসন্ধিকাল বা কিশোর বয়সের আগে পর্যন্ত ছেলেমেয়েরাই হচ্ছে শিশু। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছর বয়সের নিচে সবাই শিশু। বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সিদের শিশু হিসেবে ধরা হয়। তোমরা নিশ্চয়ই জাতিসংঘ সম্পর্কে জানো, জাতিসংঘ হচ্ছে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে সহযোগিতা দানের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার সনদ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে এটি আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশে পরিণত হয়। ইতিহাসে এটি হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৯১টি দেশ এই চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে, বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি।

পাঠ ১- শিশুর অধিকার

অতি শৈশব থেকেই শিশু যদি অবহেলা অনাদরে জীবন যাপন করে, অপুষ্টি ও রোগের কারণে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ে, শিক্ষার অভাবে অজ্ঞতায় ডুবে থাকে তাহলে তার জীবন বিপন্ন হয়, শৈশবেই তার অনেক সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে। তাই এই সনদের ৫৪টি ধারায় শিশুকল্যাণ নিশ্চিত করাসহ সকল প্রকার শোষণ, বৈষম্য, অবহেলা এবং নির্যাতন থেকে রক্ষার বিবরণ রয়েছে। সনদের কয়েকটি ধারা এখানে আলোচনা করা হলো—



১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু

১৮ বছর পর্যন্ত শিশুর মর্যাদা— জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু। যদি না দেশের আইন আরো কম বয়সের ব্যক্তিকে সাবালক হিসেবে অনুমোদন করে।

সকল শিশুরই সমান অধিকার— সনদ অনুযায়ী সব শিশুর সমান অধিকার রয়েছে। এখানে লিঙ্গ, বর্ণ, জাতীয়তা, ধর্ম, শারীরিক সামর্থ্য এবং ধনী ও গরিব কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। অর্থাৎ কোনো কারণেই শিশুর মধ্যে বৈষম্য থাকবে না।

- শিশুমাছই খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও শিক্ষার সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে।
- সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী শিশুর নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ভাষা চর্চার অধিকার আছে।
- জন্মগত ত্রুটি, দুর্ঘটনার শিকার কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শিশু যদি শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হয় সেও স্বাভাবিক শিশুর মতো সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে।



সকল শিশুরই সমান অধিকার

প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার রয়েছে— রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো প্রতিটি শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। সব শিশুর জন্য মাধ্যমিক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। সরকারের পক্ষে যদি এ সুযোগ বিনামূল্যে দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে প্রয়োজনবোধে সরকার আর্থিক সহায়তা দেবে। শিশুর স্কুল ত্যাগের হার কমাতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।



শিক্ষার অধিকার

শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে—

- শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো,
- শিশুর মধ্যে তার মা-বাবা, শিক্ষক, বড় ও ছোটদের প্রতি, নিজের দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি এবং অন্যান্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা জন্মানো।

পাঠ ২- শিশুরা কোনো শাস্তি ভোগ করবে না, শিশুর স্বার্থ সবার ওপরে ও শিশুশ্রম

শিশুরা কোনো শাস্তি ভোগ করবে না

১৮ বছরের আগে যদি শিশু কোনো অপরাধমূলক কাজ করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। শিশুর ক্ষেত্রে যা করণীয়—

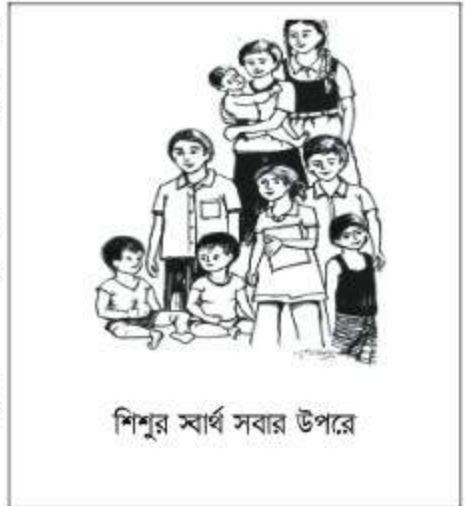
- সংশোধনের জন্য শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো যাবে।
- শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে কিশোরদের বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ দ্বারা সংশোধনের মাধ্যমে অপরাধমূলক আচরণ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া।
- পিতামাতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অন্যায় কর্মকাণ্ড বা বিবাদের জন্য শিশু কোনো শাস্তি ভোগ করবে না।



শিশুরা কোনো শাস্তি ভোগ করবে না

শিশুর স্বার্থ সবার উপরে— শিশু বিষয়ে সব কাজে লক্ষ রাখতে হবে, যেন শিশুর স্বার্থই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। এর অর্থ এই নয় যে শিশু যা চাইবে সেটাই করতে হবে। বরং এটাই বলা হচ্ছে যে—

- শিশুর অধিকার রক্ষার্থে যা কিছু প্রয়োজন তা করতে হবে। মা-বাবা অর্থাভাবে যদি শিশুর শিক্ষা, নিরাপত্তা, যত্ন দিতে না পারেন, তখন সরকার শিশুর স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে সেবা নিশ্চিত করবে।
- সরকারি ও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। যেমন—ইউনিসেফ, সেভ দ্য চিলড্রেন, কেয়ার ইত্যাদি।
- সকল সামর্থ্যবান মানুষের উচিত দৃষ্টিশীল শিশুদের সহযোগিতা করা। তাদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া।



শিশুর স্বার্থ সবার উপরে

শিশুশ্রম— আমাদের দেশে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে না গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত হয়। অনেক শিশু আবার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন রকম কাজ করে। এসব শিশু অর্থ উপার্জন করে মা-বাবার হাতে তুলে দেয় সংসার খরচের জন্য। শিশুরা বৈচে থাকার প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনের জন্য যে পরিশ্রম করে তাকেই শিশুশ্রম বলে।

বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ এর ২(৬৩) নং ধারায় ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এমন শিশু দ্বারা সম্পাদিত শ্রম 'শিশুশ্রম' হিসেবে ধরা হয়।

অনেক শিশু এমন কাজ করে যার ফলে তাদের মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকিও রয়েছে। এ ধরনের কাজে নিয়োজিত শিশুদের শ্রমকে বলা হয় ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম। যেমন— বোঝা বহন, ওয়ার্কশপের কাজ, বর্জ্য থেকে জিনিস সংগ্রহ, টেম্পুর সাহায্যকারী ইত্যাদি। অল্প বয়সের শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হলে শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই সনদে—



শিশুর স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের, বিনা খরচে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের এবং অসুস্থতায় চিকিৎসা লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত না করানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রকে বলা হয়েছে। এতে তোমাদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। যেমন— তোমার বা তোমার আত্মীয়স্বজনের বাসায় যেসব শিশু কাজ করে তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে। অভিভাবকদের বলে তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করবে। বিভিন্ন উৎসব যেমন ঈদ বা পূজায় দরিদ্র শিশুদের নতুন কাপড় ও ভালো খাবার দেবে এবং বন্ধুদেরকে ও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করবে।

কাজ ১— গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুর অধিকারগুলো লেখো।

পাঠ ৩— শিশুপাচার

শিশুপাচার— শিশুপাচার আমাদের দেশের একটি সমস্যা। পাচারকারীরা শিশুর পিতামাতাকে বা অভিভাবককে না জানিয়ে বা প্রতারণা করে, ভয় বা লোভ দেখিয়ে অথবা জোরপূর্বক ধরে নিয়ে বা অপহরণ করে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয় অথবা বিক্রি করে দেয়। একে 'শিশুপাচার' বলে। শিশু চুরির জন্য সংঘবদ্ধ চক্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে আছে। তারা যা করে—

- অর্থের বিনিময়ে শিশুদের দেশের বাইরে পাচার করে
- আটক করে পিতামাতার কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে
- অমানবিক কাজে ব্যবহার করে।

সনদে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। পাচার থেকে রক্ষা পেতে যা করতে হবে—

- দূরে কোথাও বা নির্জন জায়গায় একাকী না যাওয়া।
- অপরিচিত বা অল্প পরিচিত কারও সাথে কোথাও না যাওয়া।
- অপরিচিত বা অল্প পরিচিত ব্যক্তির দেয়া কোনো খাবার, খেলনা, টাকাপয়সা ও কোনো জিনিস না নেওয়া। মা-বাবার
- অনুমতি ছাড়া কারও সাথে কোথাও না যাওয়া।



পাচারকারীকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিল

- শিশুপাচারের কৌশলগুলো জানা এবং অপরকে জানানো যেন সবাই এ বিষয়ে সচেতন হয়।
- নিজ এলাকার শিশুসহ সকল মানুষের মধ্যে শিশুপাচার বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- আমাদের দেশের বেশির ভাগ শিশু সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচার হয়। তাই সীমান্ত এলাকায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা খুব দরকার।

আমাদের দেশে শিশু পাচারের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে। তার অন্যতম কারণ আমাদের দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব।

শিশুর মতামত প্রদানের অধিকার— প্রতিটি শিশুর স্বাধীনভাবে নিজস্ব মত প্রকাশের এবং নিজ সংক্রান্ত যেকোনো বিষয় বড়দের জানানোর অধিকার আছে। শিশুর বয়স এবং পরিণত বুদ্ধির কথা বিবেচনা করে বড়দের উচিত শিশুদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া।

- ৫ ও ৬ বছর বয়স থেকেই শিশুর ভালোমন্দ বোঝার বয়স হয়। পারিবারিক কিংবা সামাজিক অনেক ব্যাপারে শিশু স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার রাখে। যেমন— পারিবারিক বাজেট পরিকল্পনা, মেনু পরিকল্পনা, বেড়াতে যাওয়া, দ্রব্য ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত শিশু দিতে পারে এবং পরিবারকে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।

- অন্য শিশুর সাথে মেলামেশা এবং আইনসম্মতভাবে দলগঠন বা দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে। যেমন-দল গঠন করে খেলাধুলা করা, বেড়াতে যাওয়া যেকোনো উন্নয়নমূলক কাজ করা। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই পিতামাতা বা শিক্ষকের পরামর্শ নিতে হবে। তাঁদের উপযুক্ত নির্দেশনা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।



শিশু তার মতামত প্রদান করছে

পাঠ ৪- ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা নিষিদ্ধ

ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা নিষেধ। প্রত্যেক শিশুর তার মা-বাবার সাথে একত্রে বাস করার অধিকার রয়েছে।

যদি কোনো কারণে শিশু মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে শিশু যে সুরক্ষা পাবে সেগুলো হলো—

- শিশু যদি তার মা-বাবা একজন বা উভয় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাদের দুজনের সাথেই যোগাযোগ করার অধিকার শিশুটির রয়েছে।
- কোনো শিশু যদি বিশেষ পরিস্থিতিতে যেমন-মা বাবার মৃত্যুর কারণে অথবা মা-বাবা আলাদা থাকার কারণে কিংবা মা-বাবার কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়ার কারণে শিশুটি পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সেই শিশুর অধিকার রক্ষার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নেবে।
- শিশু হারিয়ে গেলে মা-বাবাকে খুঁজে বের করা এবং শিশুকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। যদি সম্ভব না হয় তাহলে সরকার তার লালন-পালন ও সুরক্ষার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেবে। যেসব সংস্থা শরণার্থী শিশুদের রক্ষার দায়িত্ব নেবে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব।

মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে শিশুকে মুক্ত রাখা— মাদকদ্রব্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে।

এইসব মাদকদ্রব্যের উৎপাদন এবং চোরাচালানে শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করা প্রয়োজন। তবে এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। শিশুদের মধ্যে অনুকরণ প্রবণতা খুব বেশি। কৌতূহল, বন্ধুবান্ধবের সাথে

আজ্ঞা, মানসিক চাপ থেকে মাদক গ্রহণের সূত্রপাত ঘটে। এই মাদক ছেলেমেয়েদের সব সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়। মাদক হচ্ছে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য যা নেশার সৃষ্টি করে, সুস্থ মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায় এবং জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি লোপ করে দেয়। তাই মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানা উচিত। ক্ষতিকর দিকগুলো হলো—

- মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। ফলে পড়াশোনা ও কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।
- মাদক গ্রহণকারী পরিবারের সদস্যদের প্রতি উগ্র আচরণ করে। পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়।
- মাদকদ্রব্য মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে নষ্ট করে, ফলে অপরের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়।
- মাদক গ্রহণের ফলে টাকার অপচয় হয়। অন্যান্য জটিল রোগ দেখা যায়, চিকিৎসার খরচ জোগাতে গিয়ে সংসারে অভাব দেখা দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মাদকদ্রব্য আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি করে। তাই সকলের উচিত মাদক বর্জন করা। এজন্য যা করণীয়—
- যেসব জায়গায় মাদক পাওয়া যায় সেখানে যাওয়া উচিত নয়।
- যারা মাদক খায় তাদের সাথে মেলামেশা বা বন্ধুত্ব করা যাবে না।
- দোকানে বা পাড়ায় কোনো বন্ধুর সাথে আজ্ঞা দেওয়া উচিত নয়।
- যদি কোনো বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি কোনো ট্যাবলেট, অপরিচিত কিছু খেতে দিয়ে বলে যে, এটি খেলে শরীরে বাড়তি শক্তি পাবে, শরীর চাঙ্গা হবে। এইসব পরিস্থিতি কৌশলে এড়িয়ে যেতে হবে, অবসর সময়ে খেলাধুলা, গান শেখা, গল্পের বই, ছবি আঁকা, সেলাই, বাগান করা ইত্যাদি গঠনমূলক ও সৃজনধর্মী কাজ করবে।



কাজ ১: জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আমাদের দেশের শিশুরা যেসব অধিকার ভোগ করতে পারছে না তার তালিকা তৈরি করে সেই অধিকারগুলো লাভের উপায় লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বৈচে থাকার অধিকার কোনটি?

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ক. তথ্য জানা | খ. স্বাধীনভাবে কথা বলা |
| গ. মানসম্মত জীবনযাপন | ঘ. স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে তুর্ঘ্য প্রায়ই একজন লোককে দেখে। মাঝে মাঝে লোকটি তাকে চকলেট খেতে দেয়। একদিন সে তুর্ঘ্যকে পার্কে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং একজন অপরিচিত লোকের হাতে তুলে দেয়।

২. তুর্ঘ্য কোন পরিস্থিতির শিকার হয়েছে?

- | | |
|------------------|-----------|
| ক. ভীতি প্রদর্শন | খ. বৈষম্য |
| গ. প্রতারণা | ঘ. অবহেলা |

৩. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে তুর্ঘ্য—

- দেশের বাইরে পাচার হতে পারে
- অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে
- মুক্তিপণের শিকার হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. রিকশাচালক আবদুল মালেকের বড় সন্তান রানার বয়স ১২ বছর। সে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। পড়াশোনায় সে খুব ভালো। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ তার বাবা অসুস্থ থাকায় ঠিকমতো কাজ করতে পারছেন না। এ অবস্থায় আবদুল মালেক তাঁর ছেলেকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির পাশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কাজে লাগিয়ে দেন।

- সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি কোনটি?
- সনদ অনুযায়ী সুরক্ষা থেকে কেন বাংলাদেশের অনেক শিশুই বঞ্চিত হচ্ছে?
- রানা কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
- জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আবদুল মালেকের গৃহীত পদক্ষেপ কতটুকু যুক্তিযুক্ত? বিশ্লেষণ করো।